একাত্তর - ফিরে দেখা

শাহ্ সাঈদ কামাল

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কথা লিখতে গিয়ে যার কথা মনে পড়ে তিনি হলেন প্রয়াত জাতীয় অধ্যপক আব্দুর রাজ্জাক । সম্পর্কে আমার চাচাশ্বশুর । উনার উপস্থিতিতে সবসময়েই একটু অস্বস্থি অনুভব করতাম, কখন না জানি জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলাপ করতে বসেন । সুখের বিষয় তিনি যার সাথে আলাপ করতেন তার বিষয়ের উপরই আলোচনা করতেন । আর সবার মতো মুক্তিযুদ্ধ ছিলো তার বিরাট দূর্বলতা । আমি মুক্তিযোদ্ধা, তাই আমার সাথে এ বিষয়েই বেশি আলাপ করতেন । সে সময়ের আমার ছোটখাটো যেসব অভিজ্ঞতা তা শুনে প্রায়ই ওনার স্বভাবসিদ্ধ স্থানীয় ভাষায় বলতেন " বাবা, এইগুলা তোমাগো একটু লেইখা রাখনের দরকার, না অইলে ভবিষ্যৎ ছেলেপুলারা জানবো কেমনে ? " অথচ তিনি নিজে কিন্তু লেখালিখিতে তেমন উৎসাহী ছিলেন না । সেদিক থেকে অমরা নিজেদের বঞ্চিতই ভাববো । লিখতে গিয়ে তাই উনার কথাই মনে পড়ছে । কিছুদিন আগে (ডিসেম্বর,২০০৮) । আমি ঢাকা ক্লাবের মাসিক ম্যাগাজিন 'Ramna Green' এ লিখেছিলাম । আমার এ লেখাটি তারই সংস্করন ।

লেখালেখিতে আমার প্রচন্ড সীমাবদ্ধতা এবং প্রায় ৩৭/৩৮ বছরের স্মৃতির দুর্বলতা স্বীকার করেই লিখতে বসলাম । মুলত দুইটি কারনে, এক, নিজের ভেতরের দায়বোধ, নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাস জানানো । দ্বিতীয়ত এবং সম্ভবত প্রধান কারন যে বাংলাদেশ, তথা বাঙালি জাতি একটা মহাসংকটময় সময় পার করছে, স্বাধীনাতার অনেকপরে হলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে । মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির পরিচয় এই সংকটকালে প্রকট হয়ে উঠছে । অতএব আমার প্রয়াস, সেই দিনগুলিতে নিজের দেখা ঘটনা গুলি তুলে ধরা ।

একাত্তরে আমার বয়স ১৭-১৮র মাঝামাঝি, সব সম্ভবের এক বয়স । মোমেনশাহী, বর্তমানে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের এইচএসসি প্রথম বছরের ছাত্র । মুক্তিযুদ্ধের এই কয়েক মাসে ছোটো বড় অনেক অভিজ্ঞতাই হয়েছে, তবে এই লেখায় যে ঘটনাগুলি তুলে ধরবো, তা সরাসরি কোনো যুদ্ধের ঘটনা নয়, যুদ্ধের পেছনের ঘটনা, সে সময়ের বাঙালি অনুভতির ঘটনা, আবেগের ঘটনা । আমি নিজে একটু আবেগ প্রবন মানুষ । ঘটনাগুলি আমাকে তখন যেমন নাড়া দিয়েছিলো, আজো তেমনি দেয় । মনে হতো এতো মনের জোর, এতো সাহস, এতো দেশপ্রেম যে জাতির, সে জাতির স্বাধীনতা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র ।

মেলাঘর হয়ে সীমান্ত পথে ঃ

ট্রেনিং নিয়ে ফিরছি, ট্রেনিং হয়েছে বিহারের চাকুলিয়া ক্যাম্পে সি-ইন-সি স্পেশাল এর দ্বিতীয় ব্যাচ - এ । আমি ঢাকার ছেলে, তাই ঢাকার আশে পাশে যুদ্ধ করার ইচ্ছা । কোলকাতা থেকে ট্রেনে আসাম, তারপর আগরতলায় ২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর মেলাঘরে উপস্থিত । সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে আহত, আমাদের যোগাযোগ ক্যাপ্টেন হায়দার, আমাদের হায়দার ভাইয়ের সাথে । চমৎকার এক মানুষ । ক্যাডেট কলেজে ক্যাপ্টেন পদবীর অফিসাররা আমাদের এডজুডেন্ট হতেন । ওনাদের দূরের মানুষ মনে হতো, কিন্তু হায়দার ভাইকে সে রকম কখনো মনে হয়নি । কী করলে এই অতি সাধারন যোদ্ধাদের ভালো হবে, স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত, এই যোদ্ধাদের অস্ত্রের যোগান হবে এবং নির্বিঘ্নে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করানো যাবে, সেই চিন্তায় হায়দার ভাই মগ্ন । অথচ সদা সপ্রতিভ, অমায়িক কিন্তু কাজের বেলায় কঠোর (এমন মানুষের অপমৃত্যু আমরা কতো সহজভাবে মেনে নিলাম) । বলে রাখা ভালো, আমার দেখা মুক্তিযোদ্ধারা শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ গ্রামের অতি সাধারণ ছেলে । এই সব ছেলেদের নিয়েই একটি দল গঠন করতে হবে, তারপর অস্ত্রের যোগান এবং বাংলাদেশে প্রবেশ । এই কাজে আমি পেলাম, একই সাথে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আব্বাস ভাই (তৎকালীন ঢাকা কলেজের ভিপি ও ছাত্রলীগ নেতা), আঙ্গুর ভাই ও ফেলু ভাইকে । আব্বাস ভাই কমান্ডার আমি টুআইসি অর্থাৎ উপ-অধিনায়ক | ৩০-৩৫ জনের দল গঠন সমাপ্ত, এখন অপেক্ষা অস্ত্রের । কিছুটা দেরি হচ্ছে, ২-৪ দিনের অবসর । আব্বাস ভাই একদিন বললেন, 'চল আগরতলা শহর ঘুরে আসি' । ঘুরতে যাব বললেই তো আর যাওয়া যায়না, দুরু দুরু বুকে হায়দার ভাইয়ের কাছে আবেদন এবং আশ্চর্যজনকভাবে আবেদন সাথে সাথে অনুমোদন । মেলাঘর থেকে বাসে আগরতলায়, আমি ও আব্বাস ভাই । ছাত্রলীগ কর্মি হিসেবে আব্বাস ভাইয়ের রাজনৈতিক যোগাযোগ ভালো, তখনকার নামি-দামি নেতাদের ভাই বলে ডাকেন, অমি অবাক হই । যাদের দূর থেকে নাম শুনেছি, তারা কতো কাছের । আগরতলার রাস্তায় হঠাৎ তখনকার তুখোর ছাত্র নেতা আব্দুল কুদ্দুছ মাখনের সাথে দেখা, আব্বাস ভাইয়ের সাথে ভালো পরিচয় । আমরা তিন জন আগরতলার স্বল্প পরিসর রাস্তায় হাঠছি, নিজেকে কেমন জানি বেশ কেউকেটা মনে হচ্ছে । একেইত ট্রেনিংপ্রাপ্ত তার উপর বিখ্যাত ছাত্র নেতার পাশে হাটছি, মনে হচ্ছিল সবাই বোধহয় বুঝতে পারছে যে আমরা অস্ত্র, বিস্ফোরক, মাইন ইত্যাদিতে দক্ষ । রাস্তায় স্বরনার্থী ও যুব শিবিরের ছেলেদের বেশ ভীড় ।

এমন সময় কথেকে ৫৫/৬০ বছরের এক বৃদ্ধের আগমন, সরাসরি আমাদের তিন জনের সামনে । সম্ভবত জানতে পেরেছে ছাত্রনেতাদের পরিচয় । তার আকুতি, " আমারে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা কইরা দে " । ট্রেনিং পাবার ব্যাপারটা যতো সহজ মনে হতো, ততো সহজ ছিলোনা । আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যুবশিবিরগুলিতে ছেলে-যুবাদের প্রচন্ড ভিড় । ট্রেনিংক্যাম্পের স্বল্পতা অতএব বৃদ্ধের ধারণা ক্ষমতাবান ছাত্র নেতারাই পারবে তার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে । তার আকুতিতে আমরা বেশ আগ্রহী হয়ে উঠি । আমাদের প্রশ্ন বাবা এ বয়সে ট্রেনিং নিয়ে কী করবেন ? বৃদ্ধের উত্তর 'আমারে শুধু ব্যবস্থাটা কইরা দে, তারপর দেখ আমি কেমনে পাকিস্তানি জল্লাদদের শেষ করি '।

" আপনার বাড়িতে কে কে আছেন " ? আমাদের প্রশ্ন ।

বৃদ্ধের উত্তর, " কেউ নাই । তিন ছেলে, সবটারে যুদ্ধে পাঠাইছি, বুড়িটারে এক আত্মীয়ের কাছে রাইখা আইছি, আমার আর কোনো পিছটান নাই । তোরা শুধু আমার ট্রেনিং এর ব্যবস্থাটা কইরা দে " ।

কী বিরাট বাস্তবতার মুখোমুখি আমি, এই আমি, আমার সামনে আমার চেয়ে প্রায় তিন গুন বয়সের বৃদ্ধ, বাড়িতে তার বৃদ্ধা স্ত্রী, তিন ছেলের যুদ্ধে গমন এবং সর্বোপরি তার নিজের বয়স, কোনোকিছুই তার মুক্তিযুদ্ধে যাবার বাসনা প্রতিহত করতে পারছেনা, কি অসীম তেজ, কী অসাধারন প্রত্যয় । এই দেশ স্বাধীন হবেনা তো হবে কোন দেশ ?

<u>ক্যাপ্টেন হায়দারকে ঘিরে স্মৃতি ঃ</u>

আমাদের দল গঠন সমাপ্ত, অস্ত্রের যোগানও শেষ, এখন সময় বুঝে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ । এই উদ্দেশ্যে মেলাঘর থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে মনতলী যেতে হবে । মনতলী ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশের ভেতর অনুপ্রবেশ করতে হবে, এমনই ব্যবস্থা । ক্যাম্পের দায়ীত্বে ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন । আগাস্টের মাঝামাঝি কোনো একদিন । আমাদের দলটি সকাল থেকেই প্রস্তুত । যার যার অস্ত্র বুঝিয়ে দেওয়া হলো । অস্ত্রের মাঝে আছে ৩০৩ রাইফেল, ৭.৬২ মি মি এস এল আর, ৯ মি মি ষ্টেন, সাথে গুলি, গ্রেনেড, বিস্ফোরক, বিভিন্ন ধরনের মাইন। সবার মাঝে একটা উৎসবের ভাব, সবাই উৎফুল্ল - বাংলাদেশে নিজ ভুমিতে ফিরে যাবো বলে । লেঃ মালেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ বুঝিয়ে দিচ্ছেন, হায়দার ভাই মাঝে মাঝে এসে তদারকী করছেন । উপ অধিনায়ক হিসেবে তদারকীর ভার কিছুটা আমার উপরও । আমাদের মনতলীতে নেবার জন্য ট্রাক প্রস্তুত । পুরো দলটি লাইন করে দাড় করানো, হায়দার ভাই রওয়ানা হবার আগে ব্রিফিং করলেন । যে যার ব্যক্তিগত অস্ত্র পরীক্ষা করে নিচ্ছে, ঠিক এমন সময়

'ঠাঁ' করে গুলির শব্দ । সবাই হতচকিত, বুঝে উঠতে পারছিনা কী হলো । হায়দার ভাই দলের মাঝ থেকে বের করলেন রফিক নামে ১৬/১৭ বছরের গ্রামের এক ছেলেকে । ঘটনা হলো, ভুলবশত সে তার ৩০৩ রাইফেলে গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন লাগিয়েছিল । অস্ত্র পরীক্ষার সময় ট্রিগারে চাপ দিলে গুলি বেরিয়ে যায় । ভাগ্যক্রমে আমাদের কারও গায়ে লাগেনি, হায়দার ভাই রেগে আগুন, এমনিই কমান্ডো হিসাবে তাকে বেশ কঠিন লাগে, রেগে গিয়ে আরও কঠিন হয়ে গেলেন । ছেলেটির অস্ত্র কেড়ে নিলেন এবং দল থেকে বের করে দিলেন । তার কথা, এখনই যদি এত দায়ীত্বহীন হয় তবে এই ছেলে ভবিষ্যতে পুরো দলকে বিপদে ফেলবে, অর্থাৎ সেই রফিকের আর আমাদের সাথে যাওয়া হবেনা । কিছুক্ষন পর ছেলেটি আমার কাছে হাজির, তার হয়ে হায়দার ভায়ের কাছে ওকালতি করতে হবে যাতে সে যেতে পারে । রফিকের চোখে জল ও প্রচন্ড আকুতি, যেনো এই যাবার উপরই তার জীবন নির্ভর করছে । অতএব আমি আমাদের কমান্ডার আব্বাস ভাইকে নিয়ে গুটি গুটি করে হায়দার ভায়ের কাছে উপস্থিত এবং রফিককে ক্ষমা করে আমাদের সাথে যাবার অনুমতির জন্য অনুরোধ করি । বেশ অনেকবার অনুরোধের পর হায়দার ভাই নরম হলেন এবং অনুমতি দিলেন । রওয়ানা হবার আগে নানা প্রসঙ্গে আমাদের বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন, এবার বিদায়ের পালা, হায়দার ভাই আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কথা বলছেন কিন্তু ভারি গলায়, তাকিয়ে দেখি তার চোখে জল বললেন-তোমরা নিজেরাও জানোনা তোমরা কত বিপদের মাঝে যাচ্ছো । বাংলাদেশের ভেতরে শুধু পাকিস্তানি শত্রুরা তোমাদের চারিপাশে থাকবেনা শত্রু তোমাদের ভেতরেও থাকবে । এইসব ছেলেরা যারা তিন অথবা চার সপ্তাহের ট্রেনিংপ্রাপ্ত, তাদের নিজ অস্ত্র নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য যে মানসিক শৃঙ্খলা প্রয়োজন, সেটা এতো অল্প সময়ে হয়ে ওঠেনা । এদের সঠিক নিয়ন্ত্রনে রাখাই হবে তোমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ তার উপর আছে বিশ্বাসঘাতক বাঙালিরা ।

আমরা বেশ উৎফুল্ল, বাংলাদেশের পথে রওয়ানা দেব বলে, কিন্তু বিদায় বেলায় এই কঠিন হৃদয়ের মানুষের চোখে জল ও কথা শুনে আমাদের মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে এলো । তাৎক্ষনিকভাবে অনভিজ্ঞতার কারনে তার কথা উপলব্ধি করতে পারিনি । কিন্তু পরে বাস্তবতায় এসে বেশ অনেকবারই কঠিনভাবে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি ।

হায়দার ভাইয়ের সাথে আমার তখনকার মেলাঘর ক্যাম্পে পরিচয়ের ব্যাপ্তি ৭-১০ দিনের । চাকুলিয়া থেকে ট্রেনিং শেষে কলকাতা হয়ে আসা (আমরা কলকাতা থেকে ট্রেনে করে কুচবিহার , আসাম হয়ে বাংলাদেশের পশ্চিম-উত্তর ঘুরে ত্রিপুরা আসি । সময় লাগে ৭ দিনের

বেশি) । এই অল্প সময়ে হায়দার ভাইকে যে খুব বেশি কাছ থেকে দেখতে পেরেছি তা নয় । শুনেছি উনি কমান্ডো ছিলেন । চলা ফেরায়, আচার আচরনে সব সময় বেশ কঠিন মনে হতো । অথচ এই অল্প সময়ের পরিচয়ে বিদায়ের সময় কঠিন মানুষটার অত্যন্ত কোমল দিকটার পরিচয় আমরা পেলাম । কী অসাধারন মমত্ববোধ । বিজয়ের ঠিক আগে সম্ভবত ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার অদূরে মুগদাপাড়ায় অবস্থিত এক জুট মিলে হায়দার ভাইয়ের সাথে মিটিং এ দেখা হয়েছিল । বিজয়ের পরে দেখা হয়েছে ঢাকায় বহুবার, তখন এই কঠিন এবং কোমল মানুষটার পরিচয় আরো পেয়েছি । যুদ্ধ মানব চরিত্রের কতো দিকই না চেনায় ।

<u>সীমান্ত পার হওয়ার অভিজ্ঞতা ঃ</u>

আগস্টের শেষ অথবা সেপ্টেম্বরে প্রথম । আমাদের ৩০-৩৫ জনের গ্রুপটি মনতলী (আগরতলা) কেম্প থেকে হাতিমারা (সম্ভবত কুমিল্লার উল্টো দিকের কোনো জায়গা) দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছি । সময় সন্ধ্যার পর, উদ্দেশ্য, মাঝ রাতে পাকিস্তান আর্মির দুটি প্রধান বাধা, ঢাকা-চিটাগাং রেল লাইন এবং সিএন্ডবি রোড (বোধ হয় বর্তমানের কুমিল্লা - ব্যাম্মনাড়িয়া সড়ক), পাড়ি দেওয়া । বেশ কিছুটা পথ হেটে তারপার নৌকায় যেতে হয় । আমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগত অস্ত্র, গোলাবারুদ ও নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বিছানার চাদরে বোচকার মতো করে বেধে পিঠের উপর - ওজন আধমন বা বেশি । পিঠে বাধা গোলাবরুদ, মাইন এর সাথে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জিনিষপত্র । কিছুক্ষন পিঠে থাকার পর বুঝলাম যথেষ্ট ভার । তার সাথে আছে অসুস্থ সহোযোদ্ধাদের বোঝা ভাগ করে নেওয়া (৩০-৩৫ জনের গ্রুপে ৩-৪ জন অসুস্থ থাকাই স্বাভাবিক) । এ যেন "বোঝার উপর শাকের আটি" । আমাদের লক্ষ্য ঢাকার পূর্বে রূপগঞ্জ থানায় বালু নদীর পাড়ে 'হরদি' বাজার (ইছাপুর বাজারের প্রায় ২ কি. মি. উত্তরে) যা বর্তমানে রাজউকের উপ-শহর প্রকল্প "পূর্বাচল" । আমাদের সাথে একজন গাইড, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য । আমাদের গ্রুপটা অনুপ্রবেশের জন্য বিশেষ সতর্কতা অনুসরন করা হয় এবং দুই বার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে । কারণ আমাদের ঠিক আগের গ্রুপটা সিএন্ডবি রোডে ব্রিজ পার হবার সময় পাকিস্তান আর্মির এম্বুসে পড়ে এবং বহু মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয় । অতএব, ঠিক কখন রওয়ানা হবো তা আগে থেকে বলা হচ্ছেনা । পাকিস্তান আর্মি কোনোভাবে আগের থেকে খবর পেলে আমাদের পরিণতি একই হতে পারে এই আশঙ্কায় । যুক্তিও আছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় ট্রেনিংপ্রাপ্ত যোদ্ধারা খুব মুল্যবান, আরও মুল্যবান অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ । ঘটনাক্রমে আমাদের আগের গ্রুপে যারা আহত তাদের দেখার সুযোগ হয়েছিল কিছুদিন আগের ঘটনায় । ছাত্র নেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখনের সাথে দেখা হওয়ার এক পর্যায়ে তিনি বললেন যে

কিছু মুক্তিযোদ্ধা আহত অবস্থায় বিশ্রামগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতালে আছে । তাদের দেখতে যাবার জন্য, তার জীপে যেতে হবে । আমরা বিশ্রামগঞ্জে বাংলাদেশ হাসপাতালে পৌছালাম । তরুন ডাক্তার জাফরুল্লা হাসপাতালটির তত্বাবধানে । ওখানেই তাকে প্রথম দেখি । ঘন্টাখানেক ওখানে ছিলাম, সে এক বিভিষিকাময় অভিজ্ঞতা । সদ্য আহত কারও হাত কেটে ফেলা হয়েছে, কারও পা কেটে ফেলা হয়েছে, করুণ স্বরে ব্যাথায় কাতরাচ্ছে, অসহায় ডাক্তাররা । প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, সরঞ্জামের অভাব । এ হাসপাতালকে আবার প্রকৃত হাসপাতাল ভাবার কোন অবকাশ নেই । মোটামুটি জঙ্গল কেটে টিলার উপর বাশের তৈরি ঘর । বিছানাগুলি বাশের মাচা, এই অবস্থা । মনে হলো, এদের আপনজনেরা কেউই জানেনা এরা কোথায় কী অবস্থায় আছে । তাদের আদরের, ভালবাসার, স্নেহের পরশটুকুও পাচ্ছেনা এই সময় । নিজেকে এদের অবস্থানে ভেবে মনটা হু/হু করে উঠলো । ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলাম । জানা ছিলো সীমান্ত পাড়ির সময় ওরা আহত হয় কিন্তু যেটা জানা ছিলোনা সেটা হলো যে আমাদের একই পথে যেতে হবে ।

ফিরে আসি আমাদের স্বদেশ যাত্রায় । হাতিমারা থেকে রাত ৯টা - ১০টার দিকে হেটে রওনা হলাম । গ্রামে বেশ গভীর রাত । বেশ কিছু সময় হেটে তারপর নৌকায় উঠলাম। বর্ষার শেষ, গ্রামের পরিবেশে শীতের হাতছানি, মনে টান টান উত্তেজনা ও উৎকন্ঠা । দুই মাস পরে ফিরছি । যে আমি ভারতে এসেছিলাম আর যে আমি ফেরত যাচ্ছি তার মাঝে বিরাট ব্যবধান । এসেছিলাম বালক, এখন এই দুই মাসে কৈশোর ছাড়িয়ে যুবক, মানষিকভাবে আরও বেশি ঋজু । দলনেতা হিসেবে আমার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে আমার সহযোদ্ধাদের জীবন-মরণ । তারা বয়সে অধিকাংশই আমার চেয়ে বড় । অতি সাধারন গ্রামের ছেলে অথচ কী সরল, সুন্দর, চোখে মুখে দেশপ্রেমের ছাপ । সামনে জীবন মৃত্যুর দোলাচল "হয় মারো নয় মরো" । মনটা কেমন করে উঠে । জীবনের অনেকটাই তো দেখা হলোনা, কেন এমন হলো ? কেন এমন হয় ? কিছু মানুষের প্রথা বহির্ভূত ক্ষমতার লোভের জন্য এতো মানুষের এত ভোগান্তি ? সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত । মনটা উদাস হয়ে উঠে । মনে হয়, আহা জীবনটা কতো সুন্দর, বেচেঁ থাকাটা আরও সুন্দর।

দুটি নৌকা ঠিক হলো, একেকটিতে ১৫-১৬ জন করে । একটির ভার আমার ওপর, আরেকটির ভার আব্বাস ভাইয়ে ওপর । মাঝরাত, বেশ আধার, ঘোর আমাবশ্যার রাত । আমাদের সুবিধা অন্ধকারে আমাদের দেখা যাবেনা । নৌকার পাটাতনের উপর পিঠের বোচকা রেখে চারিদিকে দৃষ্টি রেখে এগুচ্ছি । মোটামুটি নির্ভিঘ্নে সামনে এগিয়ে চলছি। মাঝরাত, সবার মাঝে সাংঘাতিক এক অব্যাক্ত উত্তেজনা । প্রথমে পার হতে হবে রেল লাইনের ব্রীজ । ব্রীজের উপর পাকিস্তান আর্মি ও রাজাকারদের বাংকার, তবে আশার বিষয় রাতের বেলায় ওরা বাংকার থেকে সাধারনত বেরোয় না । রেল ব্রীজের কাছাকাছি গিয়ে অপেক্ষা রাজাকারদের সংকেতের । ভয় হয় আবার না এম্বুশে পড়ি । আমরা মোটামুটি গাইডের উপর নির্ভরশীল । গাইড অপরিচিত আর যুদ্ধের সময় এমন যে, কাউকেই বিশ্বাস করা যায়না । আমাদের বাঙালিরাইতো জামায়াত এ ইসলামী, রাজাকার, আলবদর । অবশেষে নির্বিঘ্নে রেল ব্রীজ পার হলাম, দুইটি নৌকাই পাশাপাশি । এখন কিছুটা নিশ্চিত অন্তত সিএন্ডবি রাস্তা পর্যন্ত । নৌকার সহযোদ্ধাদেরকে উপর নজর রাখতে হচ্ছে, কেউ যেন আবার বিড়ি - সিগারেট না ধরায় । যুদ্ধক্ষেত্রে এটা একেবারেই মানা, শত্রুর গুলির নিশানা হওয়ার খুব সহজ উপায় ।

দুর থেকে সিএন্ডবি রোড দেখা যাচ্ছে, আরও দেখা যাচ্ছে বাতি নিভিয়ে পাকিস্তান সোনাবাহিনীর গাড়ির কনভয়ের আনাগোনা । আমরা সতর্কতার সাথে এগুচ্ছি সবচেয়ে বিপজ্জনক বাধা অতিক্রম করার জন্য । দূর থেকে ব্রীজটিকে আবছা দেখা যাচ্ছে, যার নীচ দিয়ে যেতে হবে । মনে হচ্ছে মৃত্যুফাঁদ । রাতের নিকষ আধারেরও একটা আলো থাকে, তাতেই অনুমান করছি ব্রীজটার অবস্থান । আমাদের গাইডের একই অনুমান । এমন সময় হঠাৎ মনে হলো আমাদের আরেকটি নৌকা পাশে নেই । এই অন্ধকারে দূরে একটা আলো আলো ভাব থাকে অথচ কাছের জিনিষ দেখা যায়না । নৌকাটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি । শুরু হল খোঁজা, ওরাও হয়ত খুঁজছে, আমরাও খুঁজছি । মাঝি চালাচ্ছে খুব সাবধানে, বৈঠার শব্দও যেন না হয় । প্রায় ঘন্টা দুয়েক পার হলো, সময়টা আরও দীর্ঘ মনে হচ্ছে । রাত প্রায় শেষ, কিছুক্ষণের মধ্যে আরেকটা নৌকা না পেলে ফিরতে হবে । দিনের আলোয় পানির ওপর নৌকায় আমরা একেবারে অসহায় । আমাদের থেকে রাস্তায় পাকিস্তান আর্মির অবস্থান গুলির দূরত্বও ভেতর । দিনের আলো ফুটে উঠেলে শত্রুর গুলিতে মারা যাওয়া ব্যতিত আর কোনো উপায় নাই । কিন্তু ফিরি কী করে? অন্য নৌকা কোথায়? প্রচন্ড দোটানা । ঠিক সেই সময় পাশ থেকে চাপা স্বরে ডাক শুনলাম। পাশের নৌকার অনুযোগ আমরা কোথায় ছিলাম, আমাদেরও একই অনুযোগ । দ্রুত অভিযোগ,

অনুযোগ শেষ করে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের তাড়াতাড়ি পার হতে হবে সময় খুব অল্প । কিছুক্ষণের মাঝে ফজরের আজান পড়বে, বেশ শীত শীত লাগছে । ঠিক এই সময় মনে হলো পানিতে কিছু একটা নড়ছে । আমরা সতর্ক, কী ওটা ? দেখি কিছু একটা সাতরে আমাদের নৌকার দিকে আসছে । খুব কাছে আসলে দেখি একটা মানুষ, আমরা আশ্বর্য, কিছুটা হতবিহবল । মানুষটাকে টেনে আমাদের নৌকায় উঠানো হলো, নানারকম শঙ্কা মনের মাঝে কাজ করছে । নৌকায় উঠানোর পর দেখলাম মাঝবয়সী এক লোক (৪০-৪৫), গায়ের রং বেশ কালো, মুখে দাড়ি, অন্ধকারে ভালো দেখা যায়না, শীতে কাপছে । আমাদের সাবধানী গলায় জিজ্ঞাসা "কে তুমি" ?

উত্তরে সে তার ভাষায় বলে "তোরা যাইছনা, ফিরা যা, তোরা যে আইবি এই খবর ওরা জানে, গেলে ঠাইট (একেবারে) মারা পরবি, ব্রিজের ওপর ওৎ পাইতা (এম্বুস) আছে । "

আমরা বিশ্বাস করিনা, আগেই বলেছি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা খুব কঠিন আবার জিজ্ঞাসা করি তার পরিচয় । সে পরিচয় দেয়না, বরং বার বার ফিরে যেতে বলে । আমাদের হাতে সময় কম, সকাল হয়ে আসছে পার হতে হলে এখনই শেষ সময় । নৌকার অন্য সহযোদ্ধারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে । এক পর্যায়ে আমরা বেশ কঠিন হয়ে উঠি এবং ধমক দিয়ে বলি যে আমাদের আসার খবর সে কী ভাবে জানলো ? আরও ভয় দেখালাম, পরিচয়

না দিলে আমরা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবো । উত্তরে সে যা বললো, তা শোনার জন্য অন্তত আমি প্রস্তুত ছিলামনা । সে বললো যে সে এখানকার রাজাকার কমান্ডার এবং আমাদের আসার খবর সে পাকিস্তান আর্মির কাছ থেকে পেয়েছে । পেয়েই সে এই বিলের মাঝে গ্রামে (অনেকটা দ্বীপের মতো) অপেক্ষা করছে । স্থানীয় হিসাবে সে জানে যে ব্রীজের নীচ দিয়ে যেতে হলে এই পথ দিয়েই যেতে হবে । তার পরের ঘটনা আমাদের জানা । আমরা বিস্মিত, কিছুটা বিচলিত। জিজ্ঞাসা করলাম এতোক্ষন পরিচয় না দেয়ার কারণ, উত্তরে সে যা বললো, সেটা আরো বিস্ময়কর । সে বললো কিছুদিন আগ পর্যন্ত তার বড়ভাই এখানকার রাজাকার কামান্ডার ছিলো । একইভাবে খবর পেয়ে কয়েকদিন আগে মুক্তিযোদ্ধাদের আরেকটি গ্রুপকে বাধা দিতে এসেছিলো । গ্রুপটি তার কথা শোনেনি বরং যখন তার পরিচয় পেয়ে সেই গ্রুপেরই একটি ছেলে উত্তেজিত হয়ে গুলি করে এবং তার বড় ভাই মারা যায় । সেই গ্রুপটি ব্রীজ অতিক্রম করার সময় এম্বুসে পড়ে এবং অনেক যোদ্ধা হতাহত হয় । আমি তার বর্ননা শুনছি আর হিসেব করছি । আমার হিসেব মিলে যায় । এই গ্রুপকেইতো আমরা দেখে আসলাম বিশ্রামগঞ্জে বাংলাদেশ হাসপাতালে । অবিশ্বাস থেকে লোকটার উপর বিশ্বাস জন্মালো । আমি দাড়িয়ে আছি এমন এক মানুষের সামনে যার বড় ভাইকে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করে মেরেছে মাত্র ৭/৮ দিন আগে । তার

অপরাধ ছিলো যে সে সেই দলটিকে বাঁচাতে চেয়েছিল । ব্যাপারটা যদিও ঘটেছিল ভুল বুঝাবুঝির কারণে । আজ তারই ছোটভাই একইভাবে জীবনের ঝুকি নিয়ে আমাদের বাঁচাতে এসেছে । নিজের মাঝে নেই কোনো রাগ, ক্ষোভ, এটাই যেন তার কর্তব্য । এ কোন স্তরের মানুষ ? এ কেমন দেশপ্রেম ?

আমরা নৌকা ঘুরাই, ফিরে আসি । ভাবনায় মনটা ভারাক্রান্ত । দেশ একদিন স্বাধীন হবে হয়তো । এ মানুষটার পরিচয় রাজাকার হিসাবে থাকবে, অথবা কোনো মুক্তিযোদ্ধার হাতে মারাও পরতে পারে । কিন্তু সে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানোর জন্য, দেশের জন্য আজ যা করলো, তাকে আমি কিসের সাথে তুলনা করবো ? যুদ্ধ বড় জটিল জিনিষ এবং কারও কাম্য হতে পারেনা । কিন্তু এ ধরণের সংকট প্রকৃত মানুষ চেনায় । এই মানুষ চেনাটাই আমার মুক্তিযুদ্ধের বিরাট অর্জন । যে প্রশ্নটির মিমাংসা আমি আজও করতে পারিনি, সেটা হল, সেই রাজাকার কমান্ডার আর আমার মাঝে, কে বড় মুক্তিযোদ্ধা ? সে না আমি ?

<u>প্রায় মৃত্যু ফাঁদে</u>

বাংলাদেশ অনুপ্রবেশের প্রথম ব্যর্থতার পর দ্বিতীয়বার অন্য পথে ঢুকি । এবারের অনুপ্রবেশটা মোটামটি বির্বিঘ্ন ছিল । সিএন্ডবি রাস্তা পার হবার পর আমাদের সবার মাঝেই স্বস্তিভাব ফিরে আসে । তখন মাঝরাত, নৌকার মাঝে কেউ টুকটাক কথা বলছে, কেউবা ঝিমুচ্ছে, দুটি নৌকায় বর্ষার ক্ষেতের মাঝে নৌকা চলচলের পথ দিয়ে নিঃশ্বব্দে এগুচ্ছে । আমাদের গাইডকে আমাদের অবস্থান জিজ্ঞাস করলাম । সে বললো কিছুক্ষনের মাঝে আমরা একটি নদী পার হব, তারপর হেটে ভোরের আগে আমাদের কুমিল্লার কোনো এক গ্রামে দিনের মত আশ্রয় নিতে হবে । আবার সেই পিঠের উপর বোঝা নিয়ে হাটা, নৌকাই তো ভালো ছিল । উপায় নেই, সংকটকালের পথ তার নিজের নিয়মে চলে ।

মাঝ রাতের পর অন্ধকার নদীর পাড়ে আমরা কোনো এক যায়গায় নামলাম । নৌকার ভাড়া চুকিয়ে গাইড এর পিছনে পিছনে ক্ষেতের আইল ধরে হাটছি, গাইডের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল । পথ ঘাট আমরা কিছুই চিনিনা । আমাদের এই নৌকার মাঝি সম্বন্ধে কিছু না বললে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারন জনগনের সম্পৃক্ততা অনেকটাই বলা হবে না ।

নৌকায় করে যখনই আমরা কোনো ব্রীজ বা পাকিস্তান সোনাবাহিনীর কোনো বাংকার অতিক্রম করছি তখন স্বাভাবিক করণেই সবাই বেশ উৎকণ্ঠায় থাকতাম । কোথায় মাঝিকে আমরা

সাহস যোগাব, উল্টো সে আমাদের অভয় দিয়ে বলতো "আপনারা একটুও চিন্তা কইরেননা, মিলিটারিরা রাতে বাইর অয়না, আমি ঠিকই আপনাগো যায়গা মতো লইয়া যামু" এই হলো আমাদের অতি সাধারন মানুষের সাহস এবং আমাদের জনযুদ্ধে সংস্পৃক্ততা । নৌকা ভাড়ার টাকাটা না নিলেই নয়, তাই নেয়া ।

বর্ষার ক্ষেতের আইল তার উপর পিঠে ভারি বোঝা নিয়ে হাটা বেশ কঠিন ব্যাপার । আমরা যারা অভ্যস্থ নই, তারা থেকে থেকেই ক্ষেতের চিকন আইল থেকে কাদায় পড়ে যাচ্ছি । এভাবে চলতে চলতে কখন যে সকাল হয়ে গেছে টের পাইনি । আমরা তখন এক বিরাট ক্ষেতের মাঝে, দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে । রাতের আধারের মাঝে গ্রামে পৌছতে না পারলে বিরাট বিপদ, দিনের আলোয় আশে পাশের সবাই দেখে ফেলতে পারে যে একটি ৩০-৩৫ জনের মুক্তিযোদ্ধা দল যাচ্ছে । এই সংবাদ শত্রুর কাছে পৌছতে কতক্ষন ? আমরা যতোই তাড়াহুড়া করি, গ্রামগুলি আরও/দূর মনে হয় । এরই মাঝে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে । যে ভোরের সূর্য সবার কাছে কাঙ্খিত তা তখন আমাদের কাছে সব চাইতে অনাকাঙ্কিত । দু, চার জন করে কৃষক মাঠে আসছে আর বিস্ময়ে আমাদেরক কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। আমাদের কাধের রাইফেলগুলি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করে ভোরের আলোয় লম্বা ছায়া ফেলে এগিয়ে চলছে । গাইডের উপর আমাদের সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে । তা হলে কি ও আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো ? আমাদের ভুল পথে নিয়ে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ? কিছু ছেলে তো গাইডের প্রতি মারমুখী, পারলে ওখানেই গুলি করে মারে । অবশেষে, মোটামুটি আলোর মাঝেই আমরা গ্রামে পৌছালাম । গ্রামের লোকজন এগিয়ে এসে যা বললো তা মোটেই স্বস্থিকর নয় । মাত্র দু-দিন আগে পাকিস্তান মিলিটারিরা এই গ্রাম তছনছ করে গেছে । গ্রামের অবস্থানটাও বিপদজ্জনক একদিকে ময়নামতি কেন্টনমেন্ট, আরেকদিকে ঢাকা-চিটাগাং রোড, অন্যদিকে থানা । মোটামুটি চারিদিকেই আমরা শত্রু পরিবেষ্টিত । উপায় নেই, তাই এই গ্রামেই দিনটা কাটাতে হবে । দুই দিন আগে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া এক বাড়িতে আমরা অবস্থান নিলাম । গ্রামের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক এলে তাদের কিছু টাকা দিয়ে আমাদের খাবারের বন্দোবস্ত করতে বললাম । তারাও শংঙ্কিত, মিলিটারি খবর পেলে আবারও বড় ঝাপটা তাদের উপর দিয়েই যাবে । এদিকে আমরা নজর রাখছি আমাদের গাইড যেন কোনো অবস্তাতেই আমাদের চোখের আড়াল না হয় । যেই গাইডের হাতে আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করে তাকে কতো অবিশ্বাস, এটাই বাস্তবতা । গ্রামের লোকদের বলা হলো তারা যেন চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলে আমাদের খবর দেয় ।

এদিকে সারা রাতের নির্ঘূম পথচলার ক্লান্তি ও উত্তেজনায় একে একে সবাই বাড়ীর উঠানে বসে ঘুমিয়ে যাচ্ছে । পিঠের বোঝাটা খুলে নেবার ফুরসত নাই । কাত হয়ে বোচকার উপরই ঘুমিয়ে গেছে । জেগে আছি দুজন, আমি ও আরেকটি গ্রামের ছেলে । আমার জন্য চোখ খোলা রাখা দায় । কিন্তু এই অবস্থায় সবাই ঘুমালো, শত্রু এলে বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে মারবে, একটি গুলিও খরচ করতে হবেনা । অগত্যা অনেক কষ্টে, চোখে পানি দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে রাখছি । বেলা সকাল ৯টা-১০টা হবে, এমন সময় গ্রামের লোক খবর নিয়ে এলো কিছু মিলিটারি এই গ্রামের দিকে আসছে । পরিস্থিতির কারণে আমি নিশ্চিত যে তারা খবর পেয়েই আসছে । খরবটা দিয়ে লোকজন গ্রামের অপর প্রান্তে চলে গেলো । দু চারজন সাহসী লোক আমাদের সাথে রইলো ।

এখন বাড়ির অবস্থানটা সম্বন্ধে একটু ধারণা দেওয়া যাক । বাড়িটি গ্রামের শুরুর দিকে, একদিকে ফসলের মাঠ, পিছন দিকে গ্রামের অন্যান্য বাড়ি, আরেক দিকে ডিষ্টিক্ট বোর্ডের কাচা রাস্তা, যেখান দিয়ে মিলিটারিরা আসছে । রাস্তার পাশে একটু ঢালু যায়গা তারপর বাগান, বিভিন্ন ফলজ গাছ, তারপর বাড়িটি । এই বাগানে এসে গাছের আড়াল থেকে আমি দেখবার চেষ্টা করলাম । মিলিটারির অবস্থান তখন বেশ দূরে । আনুমানিক ১০-১২ জনের গ্রুপ এক লইনে মার্চ করে গ্রামের দিকে আসছে । অমি ও আমার সাথের ছেলিটি ফিরে এসে ঘুমন্ত সহযোদ্ধাদের কাউকে ধাক্কা দিয়ে কাউকে পানি ঢেলে জাগিয়ে তুলি । সবাই সজাগ হলে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলি । তাড়াতাড়ি করণীয় ঠিক করে আমি ১০ জন ছেলে নিয়ে সামনে বাগানে গাছের আড়ালে অবস্থান নেই । সিদ্ধান্ত, শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চলবে গুলি না করার, কারণ এই শত্রুর ১০-১২ জনের দলটিকে ঘায়েল করতে হয়তো অসুবিধা হবেনা, কিন্তু গোলাগুলি আরম্ভ হলেই আমরা পুরো ফাঁদে আটকে যাবো । কেন্টনমেন্ট এবং থানা থেকে ওদের শক্তিবৃদ্ধি করতে পেতে দেরি হবেনা । এই অচেনা যায়গায় এতবড় যুদ্ধের ঝক্কির সামর্থ আমাদের নেই । অর্থাৎ গুলি হওয়া মানেই আমাদের পুরো দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, চারিদিক থেকে আমরা অবরুদ্ধ হয়ে যাবো ।

এদিকে শত্রু এগিয়ে আসছে ২০০ গজ, ১০০ গজ, দুরত্ব দ্রুত কমে আসছে । তাদের একেকটি কদম যেন আমার বুকের উপর এসে পড়ছে । কড়া নির্দেশ, আমি গুলি করার সাথে সাথে অন্যরা গুলি করবে তার আগে নয় । চরম উত্তেজনা, শত্রু ৩০-৩৫ গজের মাঝে চলে এসছে । গুলি করলে পুরো দলটিকেই শেষ করা যাবে । সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে । সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আর দেরি করা সম্ভব না । এবার শত্রু আমাদের দেখে ফেলবে । আমি ট্রিগারে হাত রেখে গুলি করার নির্দেশ দেবো ঠিক তখনই মিলিটারির দলটা থমকে দাড়ালো, কিছুক্ষন এদিক-সেদিক তাকালো

তারপর উল্টো ঘুরে যেদিকে থেকে এসেছিলো সেদিকে রওয়ানা হলো । আমাদের সবার যেনো ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ালো । এরপর সারাদিন যে কীভাবে কাটলো আমার মনে নেই । কখন উঠেছি - কখন খেয়েছি কিছু মনে নেই । একেবারে সন্ধ্যায় উঠে আবার ঢাকার পথে রাতের যাত্রা শুরু । বেঁচে থাকার আনন্দটাই অন্যরকম ।

ঃ ১২ ঃ

দেশপ্রেমী মা

ঠা - ঠা - ঠা, কানের কাছে গুলির আওয়াজে, লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম । কয়েক মুহূর্ত স্থিত থেকে বুঝার চেষ্টা করছি কী হচ্ছে । ইতোমধ্যে সহযোদ্ধাদের অনেকেই আমার মতো জেগে উঠেছে । গুলির শব্দ শুনে মনে হলো পাকিস্তান আর্মির আক্রমন । ব্যক্তিগত অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম । ঘর মানে, মাটির ঘর, দেয়ালটা খুব পুরো । ভিতর থেকে ঠিক কোন দিক থেকে শব্দটা আসছে বোঝা কঠিন । আমার সাথের যোদ্ধারারাও বেরিয়ে এসেছে । গ্রামের দু/চার জন উদ্বিগ্ন মানুষ আমাদের ক্যাম্পের পাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। প্রথমে যে আশংকা করেছিলাম যে আমাদেও ক্যাম্পের উপরই আক্রমন হয়েছে, এখন মনে হচ্ছে একটু দূওে, ২-৩ মাইল হতে পারে । রাতের নিস্তব্ধতার জন্য এতো কাছে মনে হয়েছিল । অনবরত চাইনিজ রাইফেল, এলএমজি-র গুলির শব্দ আসছে ।

যে দিনের ঘটনা সেটা হলো রোজার ঈদের দিন পেরিয়ে যে রাত সেই দিবাগত রাতের । গুলির শব্দ আসছে দক্ষিণ দিক অর্থাৎ ইছাপুর বাজারের দিক থেকে । ঐ দিকটায় মায়া ভাই এবং আরও দুই একজনের ক্যাম্প । আমাদের ক্যাম্প হরদি বাজারে । সরাসরি আমাদের ক্যাম্পে আক্রান্ত না হওয়ায় সাময়িক স্বস্তি । এই সময় গ্রামের কিছু লোক এসে খবর দিলো যে ইছাপুরেই আক্রমন হয়েছে । বর্তমানে যে বিমানবন্দর, সে দিক থেকে একটা কাঁচা রাস্তা সোজা পূর্ব দিকে (উত্তরখান-দক্ষিনখানের মাঝ দিয়ে ৪-৫ মাইল আনুমানিক) ইছাপুরার দিকে এসেছে । পাকিস্তান আর্মি সেই রাস্তা ধরেই এদিকটায় এসেছে । আগেই বলেছি, এই এলাকাটাই বর্তমানে পূর্বাচল প্রকল্প । এর মধ্যেই আব্বাস ভাই, ফেলু ভাই ও আঙ্গুর ভাই এসে উপস্থিত, আমরা চারজন ও গ্রুপের বয়োজ্যেষ্ঠ কয়েকজনকে নিয়ে আমাদের করণীয় কী সে ব্যাপারে আলোচনায় বসলাম সংক্ষিপ্ত আলোচনা, দ্রুত সিদ্ধান্ত হল ;

১। আমাদের ক্যাম্পের গোলাবারুদ সব জঙ্গলের বিভিন্ন যায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে যদি কোনো কারণে আমাদের পিছু হঠতে হয় তবে এই গোলাবারুদ যেনো পাকিস্তান আর্মির হাতে না পড়ে । এই সংকট কাটার পর ঐ সব গোলাবারুদ উদ্ধার করা যাবে । কিছু লোককে এই দায়িত্ব দেওয়া হলো ।

আমাদের গ্রুপে তখন লোক সংখ্যা ৩০-৩৫ থেকে প্রায় ১০০ এর কাছাকাছি । অধিকাংশই স্থানীয় ছেলে ও যুবক নতুন যারা সংযোজিত, তাদের আমরা শুধু কিছু

নুন্যতম প্রশিক্ষন এবং গ্রেনেড, রাইফেল চালানো কিছু কিছু শিখিয়েছি কিন্তু তাদের অস্ত্র দেওয়া সম্ভব ছিলো না । মূলত তাদেরই এই দ্বায়িত্ব দেওয়া হলো । কিছু ছেলে রাজাকার বাহিনী থেকে পালিয়ে অস্ত্রসহ আমাদের সাথে যোগ দেয়, সংখ্যা ৩/৪ জন, তাদেরও এই দায়িত্বে সম্পৃক্ত করা হলো ।

২। ৭-৮ জন করে ৪টি ভাগে ভাগ হয়ে আমরা গুলির শব্দের উৎসের দিকে রওয়ানা দেবো, এবং গ্রুপ কমান্ডারের স্বিদ্ধান্তে, যেখানে যেরকম প্রয়োজন সেভাবে পাকিস্তান আর্মির মোকাবেলা করবো ।

৩। কিছু ছেলে ক্যাম্পে থাকবে, বিকল্প ক্যাম্প হিসেবে আরও ২টি যায়গা নির্ধারিত করা হলো । যদি কোনো কারনে আমাদের ক্যাম্পটি হাতছাড়া হয় তবে বিকল্প ক্যাম্প গুলিতে আমরা জড়ো হবো ।

৪। গ্রামবাসীদের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে বলা হলো এবং শত্রুর ব্যাপারে কোনো তথ্য পেলে সবচেয়ে কাছের মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপকে জানানোর জন্য বলা হলো ।

মুক্তিযোদ্ধারা, যারা বাংলাদেশের ভিতরে, শত্রুর বেষ্টনির মাঝে থেকে যুদ্ধ করছে, তাদের মূলত গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে । এই ট্রেনিং এর মূল উদ্দেশ্য হল "Hit and Run" অর্থাৎ শত্রুকে তরিৎ আঘাত করে দূরে সরে যাওয়া । শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত রাখাই যার মূল লক্ষ্য । আরও গুরুত্বপূর্ন হলো শত্রুর মানোবলকে ভেঙে ফেলা । আমাদের অস্ত্রের যোগানও সেভাবেই দেয়া, ষ্টেন গান যার গুলির কার্যকরী দূরত্ব ৫০ মিটার, শহরের ভেতর, স্বল্প দুরত্বে যুদ্ধের জন্য খুব উপযোগী । এসএলআর যা সিঙ্গল শট অটোমেটিক রাইফেল - যার গুলির কার্যকরী দূরত্ব ৩০০ মিটার তার সাথে যথেষ্ট পরিমানে গ্রেনেড, বিভিন্ন ধরনের বিষ্ফোরক, নানা প্রকার মাইন দেওয়া হয়েছিলো যা মূলত বিষ্ফোরণের কজে যেমন গুরুতপূর্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্রীজ, কালভার্ট অথবা এমন স্থাপনা যেটা শত্রু পক্ষকে বিপর্যস্ত করবে তা ধ্বংষের কাজে ব্যবহার করার জন্য । তাছাড়া আমাদের ট্রেনিং এর স্থায়ীত্ব ৩,৪ বা ৫ সাপ্তাহ । এতো অল্প সময়ে অস্ত্র, গোলাবারুদ সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায় মাত্র । অতএব অস্ত্র ও ট্রেনিং এর অপ্রতুলতা থাকা সত্বেও যুদ্ধের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আসল পুঁজি ছিল নিরেট দেশপ্রেম, সাহস এবং সর্বোপরি সাধারন মানুষের সমর্থন ও সাহায্য । মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মূল সরবরাহ লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে জনগনই তাদের থাকা, খাওয়া ও অন্যন্য আনুষাঙ্গিক ব্যাপারে আসল ভরসাস্থল ছিল।

অপরদিকে পাকিস্তান আর্মি একটি নিয়মিত, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী ট্রেনিং এবং অস্ত্র এই দুই দিকেই তারা একটি যে কোনো আধুনিক সেনাবাহিনীর সমকক্ষ । তাদের দুর্বলতা ছিল নৈতিকতা তথা আদর্শগত দিক ও মনোবল ।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি । আমি ৮ জনের একটি গ্রুপ নিয়ে ইছাপুরা বাজারের দিকে রাওয়ানা হলাম । ভোরের সূর্যের আলো ফুটে উঠছে । শত্রু মোকাবেলায় আমরা সড়ক পথে এগুচ্ছি । মা এর মুখটা ভেসে উঠল, নিশ্চয়ই এখন ফজরের নামাজ শেষে আমার জন্য দোয়া করছেন । মনে মনে বললাম 'মা আরও বেশি দোয়া করো' । তোমার দোয়াই আমাদের সকলের খুব বেশি দরকার । আমাদের ৮ জনের মধ্যে ৫ জনের হাতে এসএলআর । বাকিদেও হাতে ষ্টেন গান, যা দূরের লক্ষ্যবস্তুর উপর গুলি করার ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবেনা । পুরো জায়গাটা জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা । আমরা এগুচ্ছি বালু নদীকে হাতের ডানে রেখে । ঘন্টাখানেক চলার পার আমরা নদীর বাঁকে এমন যায়গায় পৌছলাম যেখানে নদীর ওপারে ইচ্ছাপুরার দিকে যাবার রাস্তা। থেকে থেকে খুব কাছ থেকে গুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ শত্রু খুব কাছে । আমাদের অবস্থান থেকে রাস্তার দুরত্ব আনুমানিক ৭৫ গজের মত, অর্থাৎ আমাদের রাইফেলের রেঞ্জের মাঝে রাস্তাটা গ্রাম থেকে বের হয়ে চারদিকে নিচু যায়গার মাঝ দিয়ে নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেছে । নিচু যারগাটায় বর্ষার পানি । মাটি ফেলা রাস্তাটা প্রায় ৬/৭ ফুট উচু । উপর দিয়ে এক সাথে ৩/৪ জনের হাটার মতো প্রশস্থ । আমরা জঙ্গলের গাছের আড়ালে একটি টিবির পাশে পজিশন নিয়ে প্রস্তুত । এমন সময় শত্রুর দেখা মিললো । দূর থেকে দেখলাম ১৫/২০ জনের পাকিস্তান আর্মির একটি দল মাটির রাস্তার উপর দিয়ে না হেটে রাস্তার দু পাশে

ঢালু জায়গা দিয়ে অস্ত্র হাতে অনেকটা কুঁজো হয়ে এগুচ্ছে । দূর থেকে মনে হল ওদের হাতে চীনা এলএমজি এবং রাইফেল। আমার ছেলেদের কাছে কড়া নির্দেশ, আমি প্রথম গুলি করলে তারপর অন্যরা গুলি শুরু করবে । মনে বেশ উত্তেজনা, এই শীতের সকালেও ঘামছি । আমাদের কারও পরনে লুঙ্গি, গেঞ্জি বা হাফ প্যান্ট গেঞ্জি, কোমরে গামছা দিয়ে গুলি বা ম্যাগজিন বাধা । পাকিস্তানি গ্রুপের অর্ধেক সৈন্য আমাদের গুলির আওতায়, বাকি অর্ধেক ঢালুর রাস্তার অপর পারে হওয়ায়, আওতার বাইরে ।

টান টান উত্তেজনা । সহযোদ্ধাদের মুখের দিকে একবার চোখ বোলালাম, শত্রু নিধনের দৃঢ় প্রত্যয়, মনে মনে বললাম 'সাবাশ' । এর পরই প্রথম গুলি আমার । সাথে সথে আমাদের অন্য অস্ত্রগুলি গর্জে উঠল । এসএলআর সিঙ্গল শট ফায়ার করে, কিন্তু কী কারণে জানিনা আমারটা পুরোপুরি অটোমেটিক হয়ে গেল । গুলির সাথে সাথে দেখলাম ৩/৪ জন লাফ দিয়ে পড়ে গেল, বাকিরা শুয়ে ক্রলিং করে রাস্তার অপর পারে ঢালুতে চলে গেল । কতজন হতাহত

হলো বোঝা গেলনা (পরে গ্রামবাসীর কাছে শুনেছি যে ৪/৫ জনকে কাধে করে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেছে)। আমরা গুলি করে কিছুক্ষণ থেমে আছি । কারণ অনবরত গুলি চালানোর মত গুলি আমাদের নেই । এর পরেই শুরু হল শত্রুর পাল্টা গুলি বৃষ্টির মতো আমাদের মাথার উপর

দিয়ে শিষ দিয়ে যেতে লাগলো । আমি কিছুটা আশংকায় কেননা এ ধরণের সম্মুখ সমরে আমাদের ছেলেরা অভ্যস্থ নয়, আতংকিত না হয়ে যায় । দেখলাম গ্রামের এই সাধারণ ছেলেগুলি দেশপ্রেমে ও মনের জোরে নিজেদের ছাড়িয়ে নিজেরাই অনেক উপরে উঠে গেছে । তারপরই আমার আপন ভাবনায়ই আমার নিজের ভুল ভাঙল । এরাতো সাধারন কোনো যোদ্ধা নয়, এরা মুক্তিযোদ্ধা। অসাধারণ দেশপ্রেম ও দায়বোধ থেকে এরা খেয়ে না খেয়ে যুদ্ধ করছে । দেশমাতার ঋন শোধ করতে গিয়ে দেশকেই ঋনী করছে । প্রত্যাশা স্বাধীনতা, সাধারন জনগনের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনেতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা । অন্য কোনো কিছুর প্রত্যাশায় নয় । ব্যক্তিগত কোনো প্রত্যাশার তো প্রশ্নই উঠেনা । আজ, স্বাধীনতার এতদিন পর এসব ভাবলে ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ।

আবার মূল প্রসঙ্গে, থেকে থেকে গুলি পাল্টা গুলি চলছে । এক সময় বুঝলাম শত্রু পক্ষ ক্রলিং করে পিছন হটে গ্রামে ঢুকে পড়েছে, তাদের আর দেখা যাচ্ছেনা । আমরা কিছুক্ষণ পজিশনে থেকে ক্রলিং করে পিছনে টিবির আড়ালে নিরাপদ জায়গায় এসে বসলাম । বুঝিনি এতটা সময় পার হয়ে গেছে । বেলা প্রায় ১০/১১ টার মতো হবে । অপর দিকে পাকিস্তান আর্মিও ছোট ছোট গ্রুপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গ্রামের ভিতরে আছে । পরে শুনিছি ওরা সংখ্যায় প্রায় ১০০ জনের মতো ছিল । শুরু হলো ইদুর বিড়াল খেলা। আড়াল আবডাল থেকে কখনও আমরা গুলি করছি কখনও ওরা গুলি করছে ।

তখন দুপুর ২টা বা ৩টা । ক্লান্ত, পেটে প্রচন্ড ক্ষুধা, যুদ্ধের উত্তেজনায় মনেই ছিলনা সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয় নাই । গাছের নিচে বসে আমরা কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছি । কিছুক্ষনের জন্য আত্মচিন্তায় মগ্ন, ভাবছি মায়ের কথা, বাবার কথা, ভাইবোনের কথা, আমার চার বছরের কনিষ্ঠ সবচেয়ে ছোট বোন নমিতার কথা সম্ভবত তখন ক্লাস সেভেন এর ছাত্রী [(এর কিছুদিন আগে আমার এইটুকুন ছোট বোনকে শাড়ি পরিয়ে রমনী বানিয়ে গাড়িতে করে পাকিস্তান বাহিনীর চেক পোষ্টকে চোখে ধুলো দিয়ে গোড়ান বাজারে মাঝ দিয়ে অস্ত্র ও গোলাবরুদ পাচার করি (সে আরেক কাহিনী)] । ভাবছি, সব বারের মতো কি এবার ঈদেও রান্না হয়েছে ? আমার মা কি আমার প্রিয় ডিমের হালুয়া রান্না করেছেন

? রান্না করলে নিশ্চয়ই চোখের জলে আমার জন্য আলাদা করে তুলে রাখবেন, কখনও খাব বলে । আমার মতো তো অন্য সব সহযোদ্ধাদের একই অবস্থা । বাঙালির জীবনে এতো নিরানন্দের ঈদ আর একটিও হয়েছে কীনা বা হবে কীনা জানিনা ।

কয়েক মূহুর্ত । হঠাৎ করে এক বৃদ্ধার ডাকে ফিরে এলাম বর্তমানে । যে ঘটনা বলার জন্য এত কিছুর অবতারনা । আমার অলৌকিকতায় বিশ্বাস বরাবরই কম কিন্তু এ ঘটনাটি আমার কাছে এখনও অলৌকিক মনে হয় । বৃদ্ধার বয়স সম্ভবত ৫০ এর কোঠায়, গ্রামের মহিলা, আরও বয়স্ক হতে পারে । দৌড়ে আমাদের দিকে আসছেন আর বলছেন "বাজানরা

তোরা একটু খাইয়া ল, খাইয়া যুদ্ধ কর" । একি ? যেখানে গোলাগুলি চলছে, যেখানে অন্য কোনো মানুষ নেই, সেখানে ইনি হঠাৎ কোথা থেকে ? জানি, কিছু বসতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই বনের মাঝে আছে, কিন্তু সবার তো নিরাপদ যায়গায় চলে যাবার কথা । বৃদ্ধা কীভাবে বুঝলো আমরা এতো ক্ষুধার্ত ? কিভাবে আমাদের অবস্থান জানলো ? আঁচলের নীচ থেকে দুটো গামলা বের করলো, একটাতে ভাত ও আরেকটাতে রান্না করা মুরগী (তার নিজের ঘরের মুরগী রান্না করে নিয়ে এসেছেন) । নিজেই ভাতের মাঝে মুরগী ঢেলে মাখিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, আমরা চরম ক্ষুধার্ত কয়েকজন, পরম তৃপ্তির সাথে ভাগাভাগি করে খেলাম । ভাবছি, বিধাতা এই অল্প বয়সে তুমি আর কত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা আমাকে দেবে ? আজ প্রায় ৩৮ বছর পরও বৃদ্ধা আমার স্মৃতিতে এখনও অম্লান । স্বাধীনতা কি তাকে কিছু দিতে পেরেছিল ? এসকল অসাধারন মানবিক গুনাবলি দেখে, মানবিক অভিজ্ঞতার মখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথের মত আমারও মনে হয়েছে "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" ।

<u>ঢাকা শহর, কিশোরী বোন - আমি ও আমার এক বন্ধু</u>

ঢাকা শহরে অপারেশনের ইচ্ছা । কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অস্ত্র-যা আমাকে আমাদের মূল ক্যাম্প হরদি বাজর থেকে আনতে হবে । এই উদ্দেশ্যে আমি ঢাকা শহর বেশ করেকবার ঘুরে গেছি । ঢাকা শহরে আসার জন্য আমি দুটি পথ ব্যবহার করতাম এটি গুলশান ২ নং মার্কেট দিয়ে বর্তমান বারিধারায় যাবার পথ, আরেকটি গোড়ান বাজারের । পথ প্রথমটিতে, অর্থাৎ তখন গুলশান লেকের উপর ব্রীজ ছিলোনা । ছিলো খেয়াঘাট । ওপারে বাড্ডার গ্রাম, ছাড়া ছাড়া বাড়ি, লেক পাড় হতে হতো নৌকা করে । লেকটা বেশ বড়, পার হবার পর মোটামুটি মুক্ত এলাকা অর্থাৎ পাকিস্তান আর্মির দখলের বাইরে । যতদুর মনে পড়ে, পায়ে হেটে বেশ কিছুদুর যেতে হতো তার পর খালে নৌকা ধরে হরদি বাজার ।

কিন্তু গুলশানের দিকটায় নৌকা ঘাট পেরিয়ে উপরে উঠলে পাকিস্তান আর্মির চেক পোষ্ট । গুলশান ২ মার্কেটটি তখন একতলা ছিল । গুদারা ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলে ৩/৪ টি বাড়ির পর একটি

আধা নির্মিত বাড়িতে আর্মি ক্যাম্পের অবস্থান । বাড়িঘর বেশির ভাগ খালি (গুলশান মুলত অবাঙালিরা থাকতো) । লেক পার হবার একটিই রাস্তা । এই ক্যাম্পে আমাকে একবার পাকিস্তান আর্মি সন্দেহ করে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আটকিয়ে রেখেছিল । অনেক দোহাই/অজুহাত দিয়ে (বাংলা, উর্দু মিলিয়ে) পকেটে রাখা জাল আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে (আর্মির ভাষায় 'ডান্ডি' কার্ড) এবং যথারীতি মুছলমানিত্বের প্রমান দিয়ে ছাড়া পেতে হয়েছিল । তার ওপর অনেকখানি হাটা পথ । সংগত করণেই অস্ত্র নিয়ে এ পথে ঢাকায় আসাটা আমার যুক্তিসংগত মনে হয়নি ।

অপরদিকে, গোরান বাজারের দিকে নৌকা নিয়ে ঘাট পর্যন্ত যাওয়া যায় । ঘাটে না ভিড়ে অন্য যে কোনো বাড়ির পিছনের অঙিনার নৌকা ভেড়ানো যায় । শত্রুর একটি ক্যাম্প আছে, তবে কিছুটা

পথ ঘুরে গেলে সেটা পরিহার করা যায় । আরেকটি ক্যাম্প হলো মালিবাগ মোড়ের কাছাকাছি । গোড়ান বাজার থেকে বেরোনোর পথ তখনকার সেন্ট্রাল গর্ভঃ স্কুলের সামনে দিয়ে । সব কিছুর বিবেচনায় এই পথটাই আমার কাছে শ্রেয় ।

এই পরিকল্পনা নিয়ে আমি এগুচ্ছি, তখন খবর পেলাম আমার ক্যাডেট কলেজের বয়োজ্যেষ্ট বন্ধু সফিকুর রহমান কোনো কারণে পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী থেকে পালিয়ে এসেছেন । ভাবলাম আমাদের এরকম ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকজনের প্রয়োজন । তার সাথে পল্টনস্থ তার বাসায় গিয়ে যোগাযোগ করে একথা সেকথার পর আমাদের বাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করলাম । উনি ওনার কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে আমাদের দলে পুরোপুরি যোগ দিতে পারলেননা তবে ঢাকায় যে কোনোরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেটাও কম মনে হলো না । আমার অস্ত্র আনার কাজে গোড়ান থেকে গন্তব্য স্থানে যাবার জন্য একটি গাড়ি প্রয়োজন । তিনি গাড়ি চলাতে পারেন, তবে তিনি এক দিন সময় চেয়ে নিলেন । পরের দিন দুজন ছেলে, ১৯-২০ বছরের হবে, সাথে নিয়ে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত স্থানে এলেন । পরিচয় পেলাম ওরা দুই জমজ ভাই । সফিকুর ভাইয়ের

পড়শী এবং গাড়িটি ওদের তবে সফিকুর ভাই চালাবেন । আমার জন্য বিরাট এক সহায় হলো । আমি আশ্চর্য যে এতো বড় একটা ঝুকিপূর্ণ কাজে সাহায়ক হতে ওদের কারও কোন দ্বিধা নাই । মনে মনে দিন তারিখ ঠিক করে আমি পর পর ৩ দিনের সময় দিলাম । বললাম এই ৩ দিনের যে কোন দিন আমি আসতে পারি এবং ওরা অবশ্যই যেনো কথা মতো প্রস্তুত থাকে ।

ফিরে এলাম ক্যাম্পে । শুরু হল গোছ গাছ, পুরো কাজটা আমি একার দায়িত্বে করছি । অস্ত্র গোলাবারুদের একটি লিষ্ট তৈরি করে ফেললাম । অস্ত্র বিস্ফোরক এবং মাইনের তালিকা এমনভাবে বানালাম যা ঢাকা গরম করার জন্য যথেষ্ট ।

আমার নির্ধারিত দিনে, খুব সকালে বিছানার চাদরে বোচকার মত করে বেঁধে রওয়ানা হলাম যাতে সকাল ৯টা - ১০টার মাঝে গোড়ান পৌছতে পারি । নৌকা ঘাটে না ভিড়িয়ে অন্যদিকে এক বাড়ির পিছনে ভিড়ালাম । কিছুটা ডাকাডাকির পর মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এলেন, সম্ভবত বাড়ির কর্তা । বললাম বোচকাটা কিছুক্ষন জন্য তার বাসায় রাখতে হবে । বোচকার ভিতর কী আছে বলনামনা, উনিও জিজ্ঞেস করলেননা । ওনার যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন, সাগ্রহে বললেন, কোনো চিন্তা না

করার জন্য এবং আমি যখন আসবো ততোক্ষন উনি থাকবেন আমাকে আমার বোচকা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য । বোচকাটা বেশ ভারি ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এটা খুব এক আশ্চর্যের ব্যাপার । কোনো পূর্ব পরিচয় নেই, পূর্ব সুত্র নেই । নির্ধিধায় উনি এই মারাত্মক ঝুঁকি নিলেন আর আমরাও নিশ্চিত যে এই সহায়তা আমরা পাবো, এটাই গেরিলা যুদ্ধের বৈশিষ্ঠ, মানুষের মাঝে থেকে তাদের সম্পৃক্ততায় তাদের জন্য যুদ্ধ করা । এটাই প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ, এরই নাম জনযুদ্ধ ।

একটি রিক্সা নিয়ে রওয়ানা হলাম পল্টনের উদ্দেশ্যে সফিকুর ভাইয়ের খোজে । প্রথমে হোচট খেলাম মূল রাস্তায় এসে, দেখি সেন্ট্রল ঘভঃ স্কুলের মুখে আর্মি একটি নতুন চেক পোষ্ট বসিয়েছে । ২/৩ জন আর্মি ও ২/৩ জন মিলিশিয়া নিয়ে । মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষা করছে । গোড়ান বাজার থেকে বের হবার এই একটাই পথ, রিকসা চলছে আর আমার মাথায় দ্রুত ভাবনা কী করি, ফিরে যাব ? না, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি । ফেরা যাবেনা, পরিকল্পনা অনুযায়ী সফিকুর ভাই প্রস্তুত ছিলেন । সেই দুই ভাইয়ের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে সফিকুর ভাইকে নিয়ে অমি বাসায় (মগবাজার) চলে এলাম,বাসায় ঢুকেই আমার ছোটবোন নমিতাকে (বর্তমানে স্কুল শিক্ষিকা ও ডাক্তার গিন্নি) - যার কথা আগে প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছি - বললাম একটি শাড়ি পরে আসতে, আমার সাথে যেতে হবে। তখন ক্লাশ সেভেনের ছাত্রী, বয়স ১১-১২ হবে । আমার উদ্দেশ্য শাড়ি পড়িয়ে, মাহিলা বানিয়ে যদি গাড়িতে ওকে নিয়ে যাই তবে হয়তো পাকিস্তান আর্মি চেক পোষ্টে না-ও থামাতে পারে ।

বলার সাথে সাথে কোনো রকম প্রশ্ন না করে সে শাড়ি পড়তে গেলো । একবারও জিজ্ঞেস করলোনা কেন এবং কোথায় যাবে । ঐ ছোট বয়সে ও দেশপ্রেমের কি বুঝতো ? তবে কি এই

মুক্তিযুদ্ধের কারণে আমাদের দেশের কিশোর, কিশোরী থেকে বৃদ্ধ সবাই একটি অন্য স্তরে চলে গিয়েছিল ? এ প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর উক্তি আমার খুব মনে ধরেছিল, উক্তিটি এরকম "মুক্তিযুদ্ধের সময়টা এমন ছিলো যে আমাদেরও কেউ কেউ নিজেদের মহামনবে পরিনত করেছিল আবার কেউ কেউ দানবে পরিনত হয়েছিল " খুবই সঠিক উক্তি । দানব বলতে এখানে বাঙালি বিশ্বাসঘাতকদের বুঝিয়েছিল । ফিরে আসি ঘটনায়, ইতোমধ্যেই আমার মা চলে এসেছেন । উনি ধারণা করে ফেলেছেন যে নিশ্চয়ই আমি সাংঘাতিক কোনো বিপদজনক কাজে যাচ্ছি, তার প্রবল আপত্তি, কিছুতেই রাজী করানো যাচ্ছেনা, কীভাবে রাজী হবেন ? নিজের ছেলেকে নিয়ে সব সময় শঙ্কা ও আতংক, তার উপর তার বাচ্চা মেয়েকে কীভাবে দিবেন । শত হলেও মা । এর মাঝেই আমার গলা শুনে আমার মেঝো বোন, আমার বড়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় ১ম বর্ষের ছাত্রী (দুরারোগ্য ব্যধিতে উনি প্রয়াত, অমার খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব)। গড়নে এবং চেহারায় চোখে পড়ার মত সুন্দরী ।

ঃ ১৯ ঃ

উনি এসে বললেন যে নমিতা নয় উনি যাবেন আমার সাথে । একি বিপদ আমার জন্য । ক্রান্তিকালে দেশের জন্য কি জীবনের মায়া এতই তুচ্ছ হয়ে যায় ? সঙ্গত কারনেই বড় বোনকে সাথে নেওয়ার পক্ষপাতি আমি নই । এর মাঝে আমার ছোটবোন শাড়ি পড়ে হাজির । বড়বোন আসাতে আমার সুবিধা হল যে মা আর ছোট বোনের ব্যাপারে বেশি আপত্তি করলেননা ।

আমরা এসে রাস্তায় অপেক্ষারত গাড়িতে উঠলাম এবং সোজা গোড়ান বাজার । এর মাঝেই প্রায় ৩ ঘন্টা পার হয়ে গেছে । আসার বোন ও সফিকুর ভাইকে মূল রাস্তায় রেখে আমি আমার বোচকা সংগ্রহ করতে গেলাম । রাস্তা থেকে দুরত্ব প্রায় আধা মাইল । গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আমার জন্য একইভাবে অপেক্ষা করছেন । যেহেতু বোচকাটা ভারি সাথে একজনকে দিলেন গাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিতে ।

গাড়ির পিছনে মাল রাখার যাযগার বোচকা বিছিয়ে রাখলাম, শুধু ১টি ষ্টেন গান সাথে ২টি ম্যাগজিন আমার পায়ের কাছে রাখলাম, সফিকুর ভাই গাড়ি চালাচ্ছেন, উত্তেজনায় প্রচুর ঘামছেন, সামনে শাড়ি পরিহিত আমার ছোট বোন পিছনে ষ্টেন ও আমি । ধীরে ধীরে আমরা চেক পোষ্টের দিকে এগুচ্ছি । ঢাকার বাইরে প্রবেশের চেক পোষ্টগুলিতে কড়াকড়ি একটু বেশি, শহরের ভিতরে ততো নয় । যতো আমরা চেক পোস্টের কছাকাছি হচ্ছি ততো আমার উত্তেজনা বাড়ছে । আমি ষ্টেন গানটা 'কক' করে নিলাম, যদি বাধা আসে তবে এসপার ওসপার কিছু একটা করতে হবে । জীবিত কিছুতেই ধরা পরা যাবেনা । আমার ছোট বোন সামনে, হয়তো এর কিছুই বুঝছেনা । তারপর এলো সেই সময়, আমরা তাদের সন্দেহে পরলামনা, উকি দিয়ে আমাদের দেখলো কিন্তু কিছু বললনা । মাথার থেকে বিরাট ভার নেমে গেলো । আমার 'মা' কে তার মেয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা

চলে এলাম পল্টনে গাড়ির মালিক দু'ভাইয়ের কাছে । এখন সমস্যা, জিনিষগুলি কোথায় রাখি ।

দু' ভাই নিজেদের মাঝে কী আলাপ করে আমাকে অবলিলাক্রমে বললো কোনো চিন্তা না করতে । গাড়িটাকে এভাবেই গেরেজে ঢুবিয়ে রাখবে, তাদের আরেকটা গাড়ি আছে এবং এ গাড়িটা কেউ ব্যবহার করে না এবং আমি যখনই আসবো, তখনই আমার জিনিষ নিয়ে যেতে পারবো । আপাতত সমস্যার সমাধান, ভবিষতেরটা ভবিষতে দেখা যাবে । এখন মনে হয়, মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি এরা পায়নি, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে কোনো অংশে এরা কম ? দেশপ্রেমে এরা অনেকেই আমাদের ছাড়িয়ে গেছে । (অস্ত্র যখন ঢাকার এনে রাখি সেটা নভেম্বরের শেষ দিক । দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি ব্যবহার করা সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি । ৩রা ডিসেম্বর থেকে পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে যায়)

ঃ ২০ ঃ

কলম ধরার আগে ভেবেছিলাম লেখার ব্যাপারটা কঠিন, লিখতে গিয়ে দেখলাম আরও কঠিন । ৩৭/৩৮ বছরের আগের ঘটনা বেশ মনে আছে, কিন্তু নাম, সময়, পরিসংখ্যান এগুলিতে গোল বাধে । কিছুটা ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে । সেই ইছাপুরার যুদ্ধে আমরা এক সহযোদ্ধাকে হারিয়েছিলাম । খবরটা আমি সে দিনই সন্ধ্যায় জানতে পারি । বাংলাদেশের ভেতর থেকে সে যোগ দিয়েছিল, অসম সাহসী ছেলে । আমার এ লেখাটি আমি আমার সেই সহযোদ্ধার স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করছি ।

আরও উৎসর্গ করছি ভবিষৎ প্রজন্মকে যাদের উদ্দেশ্যে এই লেখা । মনে রেখ এই বাংলাদেশটা আমাদের, মুক্তিযোদ্ধাদের , যেখানে গোটা বাঙালি জাতি যোদ্ধা, গুটিকয়েক বাদে । ধর্মের বানিজ্যের জন্য, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য আমরা যুদ্ধ করিনি, দেশ স্বাধীন করিনি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই চেতনা নিয়ে তোমরা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবেই আমাদের এই যুদ্ধ, একটা জাতির এই অপরিসীম ত্যাগ স্বার্থক হবে ।

****